# আমার বটম্ লাইন হচ্ছে শিল্প একটি প্রক্রিয়া, ক্রিয়া নয়

**রাতুল : আপনার ছবি আঁকার প্রথমদিকের ইতিহাসটা একটু বলুন। আপনার বেড়ে ওঠা এবং তারপর আস্তে আস্তে পেশাদারি ছবির দিকে আসা এইটা নিয়ে কিছু বলুন।**

**হিরণ :** আমার আঁকা তোমরা কতদিন ধরে দেখছ।

**রাতুল : আমরা খুব বেশিদিন দেখিনি। মূলত অনুষ্টুপের কভার থেকেই আপনার ছবি দেখতে শুরু করি। ততদিনে আপনার নিজস্ব শিল্পভাষা তৈরি হয়ে গেছে। তার আগে কি ছিল সেগুলো আমরা খুব একটা দেখিনি।**

**হিরণ :** আমি কলকাতায় এসেছি ষাটের শুরুতে। তখন আমার পনেরো বছর বয়স। আর্ট কলেজে যখন আসি তার আগে কলকাতায় এসেছি অনেকবার, আমার দিদি জামাইবাবু থাকতেন সেই সুবাদে। কলকাতার আর্ট কলেজ বা কলকাতার ছবি আঁকার যে জগৎটা তার সঙ্গে আমার সরাসরি পরিচয় ৫৭ সাল থেকে। আমার পাশের বাড়ির ছেলে হরভূষণ মাল আর্ট কলেজে ভর্তি হয় ৫৭ সালে। তার সুবাদে আর্ট কলেজীয় ধারা এগুলো আমি দেখতে পেতাম। খড়্গপুরে আমার বাড়ি। খড়্গপুর তখন দু টাকার মতো ভাড়া ছিল। আর্ট কলেজ অনেক ধরনের ছিল। তখনকার দিনেও ছিল। এখনও আছে। সরকারি, বেসরকারি। এখন দৃশ্যটা পাল্টে গেছে। ইউনিভার্সিটিগুলো এখন আর্ট কলেজগুলোকে এক্তিয়ারভুক্ত করেছে। তখন ছিল ডিপ্লোমা এবং তখন স্বাধীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা এক্তিয়ার ছিল। যেহেতু তাদের তত্ত্বাবধানে এবং আর্থিক অনুদানে চলত। সেটা একটা দিক। মূলত আর্ট কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি, বিশেষ করে সরকারি আর্ট কলেজের পদ্ধতি। বেসরকারির দুটো ভাগ আছে। বিরোধও আছে। এই বিরোধগুলো কৃত্রিম বিরোধ। এমনিতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের বিরোধ আছে। পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের, উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পগত, সাংস্কৃতিক বিরোধ আছে। ছবি দেখা, ছবি বোঝা, ছবির appriciation এ অনেক বিরোধ আছে। সেটা একটা দিক।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূত্র ধরে ব্রিটিশরা পূর্বভূখন্ডে প্রথম আর্ট কলেজ তৈরি করে। যদিও ঐটা নিয়ে বিতর্ক আছে দক্ষিণ ভারতের লোকরা বলে তারা করেছে। ১৮৫৪ সালে স্টুডিও তৈরি হয়। তারপর স্কুল তৈরি হয় ১৮৬৪ সালে। ব্রিটিশ আকাদেমির যে ঘরানাটা সেই ঘরানাটা এখানে শুরু হয়। বিশেষ করে পূর্ব ভূখণ্ডে ওরা শুরু করে। Art education কাকে বলে, কেন art education। আমি এবং আমার বন্ধু হরভূষণ মাল—তখন ক্লাস ফাইভ্ এ পড়ি। সেসময় আমরা ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকতাম। আমাদের কেউ হয়তো বলেছিল অথবা আমরা হয়তো শুনেছিলাম ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকার কথা। বাইরেটা দেখতাম। স্টাডি করতাম। ট্যাংরাহাট বলে একটা হাট ছিল আমরা সেখানে যেতাম। ঐ হাটে প্রচুর লোক আসত, বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ক্যারেকটারের লোক আসত। আমি আর হরভূষণ দেখতাম।

**রাতুল : আপনি কি প্রথম থেকেই মানুষের প্রতি ক্যারেক্টারের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড্। আপনি বারবারই বলছেন আমি বাড়ির লোকেদের স্টাডি করতাম।**

**হিরণ :** আমার যতটুকু স্মরণে অছে বছর দুয়েক যখন আমার বয়স তখনই দেখতে পাই একটা দেয়ালে মুখ আঁকা আছে। রাস্তার দেওয়ালে আঁকা মানুষের মুখ। আমার বাড়িতে ছবি কেউ আঁকত না। আমার মামারা শুনেছি আঁকতে -টাকতে পারত। সেজদা কপি করতে পারত। মেজদাকে এসে বললাম এরকম আমি একটা মুখ দেখেছি, তুমি একটু দেখিয়ে দাও তো। অপরাধীর স্কেচ আঁকা হয় যেমন করে ঐরকম আর কি। মেজদা দেখিয়ে দিয়েছিল তারপর আমি আঁকতে শুরু করি। আরেকটা জিনিস ছিল আমাদের খড়্গপুরের দেশের বাড়িটা একটা বাজারের উপরে। সারাক্ষণই আমি মুভিং ইমেজ দেখতাম সেই ছোটো বয়স থেকে। আর আমাদের বাড়িটাতে অনেক ঘর ছিল, কুড়ি-বাইশটা ঘর ছিল। আমাদের বাড়িতে অনেক ভাই বোন। আমি যখন জন্মাই তার আগে ছয়জন মারা গেছে। ছয়জন খুব বিচিত্র ভাবে মারা গেছে। আমি ছোটো ছিলাম বলে সবার আমার উপরে বিশেষ নজর ছিল। এটা যেন ঠিকঠাক থাকে। ঠিকঠাক তো থাকল না। যা গণ্ডোগোল হবার হল। সেইসময় বাড়ির ছাদ থেকে, বারান্দা থেকে লোক দেখতাম। সেটা একটা আকর্ষণ, এমনিতেই মানুষের Static Image থেকে Moving image এর দিকে নজর থাকে। যে কোনো জিনিস নড়লে চোখে পড়ে না বেশি, সেরকম আর কি!

**মৌ : দৃশ্য উঠছে নামছে, দৃশ্য সরে যাচ্ছে। অনন্তকালের বুকে একটা দৃশ্য স্থির হয়ে যায়। তাই আপনি ক্যানভাসে তুলে আনেন?**

**হিরণ :** আমার ভিসুয়্যাল মেমারি, খুব স্ট্রং। আমি এমনি কথা মনে রাখতে পারি না, কিন্তু আমি দৃশ্য মনে রাখতে পারি। একেবারে vividly মনে রাখতে পারি। আমার দৃশ্য মনে রাখার একটা বিচিত্র কাহিনি আছে। সেটা এখানে বলে দেওয়া ভালো, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তরুণ বলে একটি ছেলে আমাকে বলল আমার বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি বললাম তোমার বাবা—কীরকম দেখতে বলোতো—নাবার

এরকম সাদা দাড়ি আছে—আমি বললাম ঐ ভদ্রলোক। আমি মেট্রোতে তাকে দেখেছি। ওর বাবাকে আমি চিনতাম না। আলাপও নেই। মেট্রো দিয়ে তো হাজার হাজার লোক যাচ্ছে। কিন্তু ও যেই বলল বাবার কথা, আমার ঐ ভদ্রলোকের মুখটা মনে পড়ল। আমার এক বন্ধু রুমতা বলে একজনের কথা বলল। সে বলল সে রুমতাকে কোনোদিন দেখেনি। আমি বললাম দাঁড়াও রুমতার ছবি আমি এঁকে দিচ্ছি। আমি বললাম আমি দেখতে পাচ্ছি রুমতাকে। চিনিনা তাও আমি একটা পোর্ট্রেট এঁকে দিচ্ছি। পরের দিন-ই টেলিগ্রাফে রুমতার ছবি বেরোলো। দেখা গেল মিলে গেছে। এখন ব্যাপার হচ্ছে এটা কেন হয়, কিসের জন্য হয় সেটা জানিনা। আমাকে ঐ লোকটাকে দেখতে হবে। সেই লোকটাই ঐ লোকটা হবে কেন সেটা আমি জানিনা। এটা বহুবার আমার জীবনে ঘটেছে। দেখা জিনিসের মধ্যে আমি একেবারে রং, জামাকাপড় সব বলে দিতে পারি। এঁকেও দিতে পারি। সম্প্রতি একটা পত্রিকা এসে আমাকে ধরল, অনেকরকম তো আপনি করলেন—তো এরকম কি করা যায়—আপনি যে অ্যাবস্ট্রাকশান নিয়ে কাজ করেন—নাটক সিনেমা নিয়ে কাজ করেন সেটা তো অতটা বিমূর্ত নয়, সেটা তো মূর্ত। সেটা কি বোঝানো যায় আপনার কাজ দিয়ে বা আপনার জীবনী দিয়ে বোঝানো যায় যে কীভাবে বিমূর্ততা এলো। আমি বললাম যাবে কিনা জানিনা, চেষ্টা করে দেখতে পারি। ঘটনাচক্রে আমার ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ হয়। তখন বাড়ি থেকে বেরোতাম না। একদিন সন্ধেবেলা মনে হল এঁকে দেখা যাক কীভাবে আমি দেখছি জীবনটাকে। আমি সত্তর-আশিটা কালো-সাদা ছবি আঁকলাম। তার থেকে তিরিশ-চল্লিশটা বাছাই করলাম। বাছাই করে সেগুলো পরপর সাজালাম। একদম ছোটোবেলা থেকে, আমার পারিপার্শ্বের দেখা সব। পরদিন সকালে আমি ছবিগুলোতে নাম্বারিং করলাম। আর পঞ্চাশ শব্দের একটা করে লেখা গেল। ওরা বলল এই যে আপনি ছবি হিসেবে দেখছেন—সেটা থেকে আমি বুঝলাম সবটাই মূর্ত, বিমূর্ততা একটা ভান। একটা বিভ্রম। কিন্তু এই বিভ্রান্তির পিছনে যে মূর্ততা আছে তার চেহারা কিরকম সেটা বিমূর্ততাতেই বোঝা যায়। জীবন থেকেই নাটক, নাটক থেকেই জীবনে যাওয়া যায়। এইটা আমার ঘটেছে। ফুটবল খেলার গোল দুটি নির্দিষ্ট। কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতের কোনো নির্দিষ্ট তিনকাঠি নেই। তিনকাঠি না থাকার জন্য যে সমস্যাটা হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে তোমাকে তিনকাঠি তৈরি করতে হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে গোল দিতে হচ্ছে। গোল না দিয়েও ভাবতে হচ্ছে তুমি নিজে গোল দিয়েছ। তুমি দর্শক, তুমি হাততালি দিচ্ছ। এই যে সমস্যাটা—বৈজ্ঞানিক সুনীতিদা আর আমার একজন মামা ছিলেন তারা বলতেন ছবি আমরা কীভাবে বুঝব—তোমাদের নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি তো নেই। এই যে ব্যাপারটা এটা খুব গোলমেলে। এভাবে শিল্প হয় না। বিজ্ঞানে দুই দুই চার হয় আমাদের ক্ষেত্রে পাঁচ হয়।

**ঐশিক : আচ্ছা হিরণদা আমাদের বাংলায় শিল্পীরা রাধাকৃষ্ণের ছবি এঁকেছেন বা কেউ কালীঘাটের পট নিয়ে কাজ করেছেন। কেউ পুরাণ নিয়ে এঁকেছেন, এইসব**

থেকে বাইরে আপনি রেখা নিয়ে কাজ করলেন আর রেখাটাই আপনার ছবিতে শব্দ হয়ে উঠল—এটা কীভাবে হল?

**হিরণ :** এটা ভালো জায়গায় নিয়ে এসেছ। আমার ছোটোবেলার দৃশ্যশিক্ষা যেটা—সেটা হচ্ছে মাসিক বসুমতি—সেটা আমাদের প্রথম সংখ্যা থেকে ছিল। এই মাসিক বসুমতিতে তখন পূর্ণ চক্রবর্তী, হেমেন মজুমদার এরকম অনেকের ছবি বেরোত। এরা আবার প্রবাসীর যে দলটা যারা আর কি অবন ঠাকুরের ছবি বের করত, তার বিরুদ্ধে ছিল। এরা হচ্ছে Western school। অবন ঠাকুর ছিলেন Bengal school এ। পূর্ব ভূখণ্ডে দুটো ভাগ ছিল। অন্যদিকে রণদাপ্রসাদ, হেমেন মজুমদার, ভবানীচরণ লাহারা ছিলেন western style of painting এ। গগনেন্দ্রনাথ এখানে ব্যতিক্রম। Bengal School এর পত্তন হয়েছিল ই.বি. হ্যাভেলের হাতে। ই.বি. হ্যাভেল ভারতীয় ছবির ধারার খুব ভক্ত ছিলেন। ই.বি. হ্যাভেল আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন। ই.বি. হ্যাভেল অবন ঠাকুরকে নিয়ে আসেন সহ-অধ্যক্ষ হিসেবে। অবন ঠাকুর বেশিদিন ছিলেন না। ওনার বাইরে ছুটিতে যাওয়ার, খাওয়া-দাওয়া করার জমিদারি স্টাইল ছিল। অবন ঠাকুর Bengal style এ কাজ শুরু করলেন। এ জায়গাটায় আমার একটা অসুবিধা যেটা—প্রথমত আমি সেই জেনারেশানের লোক নই, আমাদের সময় সমস্যা পাল্টে গেছে। আমার ১৯৪৫-এ জন্ম। ন্যাচারালি ৫০ সালের ভারতবর্ষ একেবারে অন্যরকম ভারতবর্ষ। আরেকটা সমস্যা ছিল এই কল্পনানির্ভর, বানিয়ে তোলা ছবি আঁকায়। ঠিক আছে—বানিয়ে আমরা তুলছি অনেক কিছু। কিন্তু এই বানিয়ে তোলার সূত্রটা যেন জীবন থেকে হয়। আমার পারিপার্শ্বিক থেকে জীবনটা হয়, সেটা যেন বানিয়ে তোলা না হয়। আর এদের এই পুরাণভিত্তিক যে ছবি সেটা বাস্তব অভিজ্ঞতার বাইরে। Primary experience আর Secondary experience বলে একটা জিনিস আছে। আমি primary experience টা বেশি বিশ্বাস করি Secondary experience থেকে। Western art এর আমাদের যে exploser সব secondary experience। Western art painting টা দেখার-ই সুযোগ নেই এখানে। সবই reproduction দেখি। সেই দেখে ছবিটার কিছুই বোঝা যায় না। ছবির কারিকুরি বোঝা যায় না। Secondary experience এর এই যে চর্চাটা এর মধ্যে অনেক জল মেশানো আছে। এইখানে মানুষদের যেভাবে দেখা হচ্ছে সেই জগৎটা বাস্তব জগতের সঙ্গে কিছু মিলত না। তাদের লেখাপত্র পড়েও আমি Impressed হইনি। এমনকি অবন ঠাকুরের 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' আমি পড়েছি অনেকবার, এটা খুব সাজানো গোছানো বলে মনে হয়েছে। এরা একটা ধারণাকে অনেক বেশি project করছেন। নিশ্চয়ই তার একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সমস্যা দুদিকের ছিল। আমার প্রথম গুরু ছিলেন পটুয়া। কিন্তু উনি প্রাথমিক ভাবে পটুয়া ছিলেন না, উনি ছিলেন মূর্তিকার। আমাদের পটুয়ারাতো এসেছে সূত্রধর থেকে। কাঠের কাজ যারা করত তারা পটুয়া ছিল। আমরা যখন ব্রিটিশ আকাদেমির মধ্যে ঢুকলাম, তখন থ্রি ডাইমেনশান,

সেন্স অফ পারস্‌পেক্টিভ আসছে। ইলিউশন বা ভ্রম সৃষ্টিকারী ছবি কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমাদের শেখানো হচ্ছে। এই দুটোর একটা মিশ্রণ হয়। একদিকে two dimension অন্যদিকে three dimension এই দুটোর মিশ্রণে আমার একটা perspective তৈরি হয়। আর একটা জিনিস এই যে আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে সত্তর সাল নাগাদ আমার পরিপার্শ্বের যে ছবি আঁকার চর্চাটা সেটা খুব বদ্ধ আর সীমিত হয়ে পড়েছিল। এই জায়গাটা থেকে আমি বেরোবো কী করে—তখন আমার মনে হয়েছিল বেরোতে গেলে এই পুরো বিষয়টাকেই বাতিল করতে হবে। অর্থাৎ এই প্রদর্শনী, প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া বন্ধ করতে হবে। এই 'ললিতকলা' নামে ভারতবর্ষে একটি অচলায়তন রয়েছে। আমরা ওটার মধ্যে ঢুকিনি। একটা সময় হত যে, ইস্টার্ন জোন থেকে ছবি গেলে ন্যাশানাল প্রদর্শনীতে বাক্স খোলা হত না। সেটা আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। বাক্স খুললে যদি ভালো ছবি বেরিয়ে যায়, সেই ভয়ে ওরা বাক্সটাই খুলত না। ফেরৎ পাঠিয়ে দিত। পরবর্তীকালে বাঙালি শিল্পীদের ছবি সমাদর পেয়েছে। সেইসময় আমি প্রায় পঁচিশ বছর এই স্ট্যাগ্‌নেন্সির আবর্ত থেকে সরে যাই। কীভাবে ছবি হবে আমি জানিনা। আমার মনে হল পারফর্মাররাই একমাত্র এনার্জি হাউস। ঐখান থেকে আমি যদি একটা ভিসুয়্যাল ডায়লগে যাই তাহলে কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। তখন আমি বাউল-ফকির একদিকে আরেকদিকে ছৌ অন্যদিকে ক্ল্যাসিকাল ডান্সার—সংযুক্তা পাণিগ্রাহী, প্রীতি প্যাটেল, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি এদের সঙ্গে কাজ করি। পুরুলিয়া, ময়ূরভঞ্জ, সরাইকেল্লা এই তিনটে জায়গার ছৌ নাচিয়েদের সঙ্গে কাজ করি। এই করতে করতে আমি document করতে শুরু করি। ঐ document করাটা ঠিক অ্যাকাডেমিক নয়, আমি মুভমেন্ট স্টাডি করতে থাকি। সেটা খুব ফার্স্ট মুভ্‌মেন্ট। মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে। কাহিনিগুলোকে ধরে 'অভিমন্যু বধ' আরও নানা কাহিনি ধরে কাজ করতে থাকি। এই সময় দীপক মজুমদার গ্রীস থেকে ভারতবর্ষে আসেন। এদিকে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সখ্যতা হয়। গৌতমের 'মহীনের ঘোড়াগুলি' তখন বন্ধ হবার মুখে কিন্তু কাজ করেছি। দীপক মজুমদারের সঙ্গে কাজ করেছি। চিত্রবাণীতে উনি এসছেন। থিয়েটার নিয়ে কাজ করতে চাইছেন। চিত্রবাণী তখন একটা Culture Centre চিত্রবাণীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেক আগে। ছয়এর দশকে। চিত্রবাণীর বাড়ি তখন হয়নি। চিত্রবাণীর সূত্র ধরে অনেক ফিল্মমেকার জড়ো হয়। এবং কাজ করতে শুরু করে। গৌতম ছিল, দীপকদা ছিলেন, পরে উৎপলকুমার বসু ওখানে ঢোকেন। আমরা ফিল্মের মুভ্‌মেন্ট নিয়ে কাজ করতে শুরু করি। নাটক নিয়ে কাজ করতে শুরু করি। তখন হাবীর তান্‌বীরও এসছেন কলকাতায়। পঁচিশটা বছর আমি এইসবই করতে থাকি। এইসব করতে গিয়ে দেখা যায় যে আসলে সবটাই চলমানতা। চলমানতার extreme জায়গায় বিদেশে গিয়ে *অ্যারিন মুশকিলের* সঙ্গে কাজ করেছি। ছয় এর দশকে আমি নাটকে আগ্রহী হই। মিনার্ভায় উৎপল দত্তের ওখানে আমার আড্ডা ছিল। তাপসদার সঙ্গে যুক্ত হই। আরেক দিকে তখন অ্যাবসার্ড নাটক নিয়ে কাজ করছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মোহিতদার সঙ্গে মুক্তাঙ্গনে কাজ করেছি।

**রাতুল : জীবনের চলমানতার সূত্রে আপনি রেখার কথা বলছেন। সেক্ষেত্রে আপনার রেখায় সাদা, কালো এবং লাল এই তিনটে রং-এরই এত বেশি প্রাধান্য কেন?**

**হিরণ :** সাদা কালোর আগে আরও গল্প আছে। আমি অনেক রং নিয়ে কাজ করেছি। ৯৭ সাল অব্দি প্রচুর রং নিয়ে কাজ করেছি। যখন আমি documentation করছি তার বেশিরভাগই সাদা কালো। Physical movement নিয়ে যেমন কাজ করেছি, তেমন Film নিয়ে কাজ করেছি। দীপকদার উস্কানিতেই কাজ শুরু করি। সেই উস্কানিটা ছিল ঋত্বিক ঘটক কে নিয়ে। ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' থেকে 'তিতাস' সব ছবিগুলো আমি বিভিন্ন সময়ে দেখেছি। সিনেমার ক্ষেত্রে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। *শাইলেন জেরার* সব ছবি আমার দেখা মুভিওয়ালারা ছবিকে আটকে এডিট করেন। ছবির ফ্রেম দেখেন। আমি ফ্রেম আঁকছি না। দুটো ফ্রেমের মাঝখানে যে ঘটনা সেটা আঁকছি। সেটার জন্য ছবিটা যখন হলে চলছে সেটা আঁকছি। ব্লাইন্ড আঁকছি। ব্লাইন্ড আঁকছি মানে আমি স্ক্রিন এর দিকে তাকিয়ে ছবিটা আঁকছি। ছবিটা কী হচ্ছে দেখছি না। এটা যেমন একটা দিক। আমার জীবনের আরেকটা ঘটনা হচ্ছে, আমি অন্ধকারের ছবি আঁকা শুরু করি। ছোটোবেলা থেকেই এটা শুরু হয়। আমাদের বাড়িতে হ্যারিকেনের আলো জ্বলত। হ্যারিকেনের আলোতে ছোটো Circle হতো। আর অন্ধকারেও আমি রং চিনতে পারতাম। ঐ সময় কালো-সাদার দিকে বেশি ঝোঁক যায়। এই ধরো অমাবস্যায় কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেই কালো আঁকতে আঁকতে কালো সাদা হয়ে গেল, ছৌ document করতে করতে কালো সাদা হয়ে গেল। এই কালো সাদা হতে হতে একটা সময় আমার ছবি খুব অ্যাগ্রেসিভ খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় আমার মনে হয় ছবিগুলো থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। মনে হয় দৃশ্যগুলো আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। সেই সময় লাল ঢুকে পড়ে। সেটা খুব স্পেসিফিক লাল। আমার কাকা ছিলেন হেডমাস্টার। কাকা খাতা দেখতেন এবং আমাদের দিয়েও দেখাতেন। খাতায় ঐ যে লাল কালির correction টা সেটা একটা আতঙ্কের মতো ছিল। সেই মারাত্মক ব্যাপারটা আমি accept করেছি এবং সেটা ৯৭ সালের পর থেকে বেশি এসেছে ছবিতে। কালো-সাদার আরেকটা দিক ছিল ছোটবেলার কালো সাদা সিনেমা।

**মৌ : আপনি উঠোনে অনেক মানুষ দেখছেন তারা আপনার ছবিতে কীভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে?**

**হিরণ :** যেটা হয় এই যে আমি এতগুলো এলিমেন্টকে দেখছি, এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যে অনেকগুলোর মধ্যে একটা কোনো ঘটনা, একটা কোনো ব্যাপার একটা কোনো সংকেত বড় হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি ঐ উঠোনটা একটা প্রতীক উঠোন। পুরো জীবনটা সেখানে আছে। একটা time span। সব সময় সব কিছু একইসঙ্গে ঘটতে পারে।

**ঐশিক : এই যে আপনার ছবি দেখে কবিরা কবিতা লিখলেন সেই ভাবনাটা কি আপনার নিজের সময়টাকে ধরে রাখতে চেয়েই এসেছিল। ছবিতে কি আপনি সময়ের ভাষাকে ধরতে চাইলেন?**

**হিরণ :** এই কারণেই শুধু নয়। আমাদের বয়সের পার্থক্য আছে। অভিজ্ঞতার পার্থক্য আছে। দেখা ও বোঝারও পার্থক্য আছে। এর পরেও আমরা পারস্পরিক সংলাপে যেতে চাই। সম্প্রতি ছয় মাস পরিশ্রম করে আমি একটা কাজ করলাম। যদিও আমি সেভাবে অভ্যস্ত নই তবুও করলাম। ১৯৩০ এ আইনস্টাইন আর রবীন্দ্রনাথের একটা সংলাপ ছিল। অমীমাংসিত সংলাপ। রবীন্দ্রনাথ সেটা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, আইনস্টাইন সেটাকে সমর্থন করেননি। সেই সংলাপটা নিয়ে একটা বই হচ্ছে। অঙ্ক নিয়ে logic নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ আছে। আমাকে বলা হয়—চিত্রকলা ও সংগীত নিয়ে একটা সংলাপ আছে। সেই যে ছয়লাইনের ডায়লগটা সেটা আমাকে ইলাবরেট করতে বলা হয়। সেটা খুব জটিল একটা ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইন ঠারেঠুরে কথা বলেছিলেন, আর সেই কথাবার্তার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল—সেটা আমার জন্মের পনেরো বছর আগের ঘটনা। তারপর এসব ইঙ্গিত, সেই ইঙ্গিতকে ব্যাখ্যা করা—সেই ইঙ্গিতকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে আমার ভাষায় সেটাকে recreate করা এটা বেশ কঠিন কাজ ছিল। সেই কঠিন কাজটা বহু পরিশ্রম করেই আমি করেছি। বলতে চাইছি সময়ের সংলাপ, সময়ের ভাষা এটাকে ধরা—যেমন আমি ১৯৩০ কে recreate করতে চাইছি সেরকম তুমি আমাকে ১৯৪৫ কে recreate করতেই পার। সম্ভব অসম্ভব কিছু নয়। কথাটা হচ্ছে কী সংযোগ আমাদের মধ্যে ঘটছে, কী কী ইঙ্গিতগুলো আমরা নিতে পারছি, কী কী বুঝতে পারছি না। এই যে 'অক্ষর কখনো ঘুমোয় না'—হঠাৎ মাথায় আসে যে আমি তো চিরকাল কবিদের কবিতা পড়ে ছবি এঁকেছি। উল্টোদিকে যদি যাই আমার ছবি দেখে যদি কবিরা কবিতা লেখেন তাহলে কি হয়—আমার তিরিশটা ছবির একটা সিরিজ ছিল। আমি সেগুলো বড় বড় digital print করি। তারপর কবিদের দিই। তাসের মতো আর কি। আপনিই বেছে নিন কোন্ তাসটা খেলবেন। সবাই একটা করে বেছে নিয়েছেন। ছমাস লেগেছে কবিতাগুলো পেতে। অনেকে ছবিগুলো টাঙিয়ে রেখেছেন দেওয়ালে, তারপরে কখনও ইচ্ছে হয়েছে লিখেছেন।

**রাতুল : আপনি গানের কথা প্রচুর বলছেন। আপনি প্রচুর মিউজিক শোনেন। ক্লাসিক্যাল মিউজিক শোনেন, মোৎসার্ট শোনেন। আপনার ছবিতে মিউজিক এবং রিদম্ কীভাবে এসেছে।**

**হিরণ :** আমাদের বাড়িতে গান-বাজনা, আঁকাআঁকি সবকিছুই ছিল নানা। একটা জিনিস-ই ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ—ওই একজায়গায় বসে পা দোলাতে হবে। আমাদের বাড়িতে গান-বাজনা ছিল না। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম। তো বাবা বললেন চেঁচাচ্ছ কেন? শিলাজিৎ আমার বন্ধু। শিলুকে বললাম আমার সব হল কিন্তু গান হল না। মানিকবাবু তো

গানও গেয়ে গেলেন। তো শিলু বলল তুমি আমার স্টুডিওতে এসে পরিত্রাহি চেঁচাও। তোমাকে কেউ বারণ করবে না। আমি গিটারে ধরে দেব ব্যাপারটা। আমি এরকম মাঝে মাঝে গেয়ে উঠি। একজন বলল বাঃ সুরটা লেগেছে। আমার একটা বিশ্বাস সেটা অনেকটা ভুল বিশ্বাসের মতো। সব মানুষের মনের মধ্যে সঙ্গীত আছে। সব মানুষের মধ্যে তাল আছে। কেন আছে। হার্টবিটটা, পালস্টার একটা রিদম্ আছে। সেটা নিয়েই সে জন্মায়। ভিতরের শরীরটা বাইরে আনা গেলে তালটা তৈরি হয়ে যায়। আমি এই পারফর্মারদের সঙ্গে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাজ করেছি। পারফর্মাররা তালের উপর বেঁচে থাকে। তাল ছাড়া জীবনে কিছু নেই। এমনকি নাটকের সংলাপেও তাল আছে। সেখানেও স্কেল আছে। স্কেলের গণ্ডোগোল হলেই সব গণ্ডোগোল হয়ে যায়। একজন ডায়লগ একটা স্কেলে দিচ্ছে। অন্যজন অন্য স্কেলে ডায়লগ বললে মুশকিল হয়। এইটা আমি যে খুব বুঝি বা চর্চা করেছি তা নয়। ছয় এর দশকের সময় থেকে আমি পাগলের মতো ইস্টার্ন মিউজিক আর ওয়েস্টার্ন মিউজিক শুনতাম। ওয়েস্টার্নদের কনসার্ট তো শোনার উপায় নেই। আমি প্রচুর মিউজিক্যাল পিস্ শুনেছি। বীথোফেন এর সিম্ফনি নিয়ে আমি ছবি এঁকেছি। আমার বাড়িটাতো কম্যুনিস্ট বাড়ি। ওরা ঐতিহ্য বিশ্বাস করে না, সমস্তটাই হচ্ছে বুর্জোয়া সংস্কৃতি। ঘটনাচক্রে লেনিন নাইন্থ সিম্ফনি শুনেছিলেন বলে শোনা যায়। তখন দাদা বলে ওটা কি রে—লেনিন শুনেছে ফলে ভালো কম্যুনিস্ট হতে গেলে ওকেও শুনতে হবে। তখন আমার একটা মাথায় ভুত চেপেছিল আমি সরাসরি মিউজিক থেকে ছবি করব। এইটা করতে করতে আশি-একাশি সালে আমি একটা প্রদর্শনী করেছিলাম সেই প্রদর্শনীতে আমি সেই মিউজিকগুলো চালিয়েছিলাম। অনেকের ধারণা হয়েছিল ওগুলো শুনতে শুনতে আমি এঁকেছি। আসলে তা নয়। অন্ধকার ঘর, ছবিগুলো আর ওয়েস্টার্ন মিউজিক দিয়ে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। '৬৯ এ বিড়লা আকাদেমিতে আমি একটা প্রদর্শনী করি। সেখানে তারকোভ্স্কির উপরে একটা পিস্ বাজানো হচ্ছিল। এবার যখন 'আরবানিয়া' হয় তখন 'ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক' একটা কোয়াট্রেট্ বাজিয়েছিল। বিকাশ সিংহ এসে খুবই উৎসাহিত উত্তেজিত হন। আমি মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ভোক্যাল এর সঙ্গে ছবি এঁকেছি। এক একটা রাগ এক একটা ঘরানায় এক একরকম ইমেজ তৈরি করে কিনা তা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। অর্থাৎ 'দেশ' রাগ 'কিরানা' ঘরানায় একরকম। 'গোয়ালিয়র' ঘরনায় একরকম। সেগুলোর ইমেজগুলো আমি এঁকেছি। বিলায়েত খাঁ সাহেবের সঙ্গে, গঙ্গুবাই হিঙ্গুলের সঙ্গে, পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর সঙ্গে এঁকেছি।

**রাতুল : আমাদের ভারতীয় রাগসংগীতে অনেক রাগ-রাগিণীর ছবি আছে। তারা একরকম ভাবে ভিসুয়্যালাইস্ করেছেন যেমন 'বসন্ত' রাগিণীতে একটা হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে মেঘমল্লারে মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখান থেকে আপনি আধুনিক সময়ের মানুষ, আপনিও রাগ-রাগিণী আঁকছেন। আপনার দেখা এবং সেইসময়ের প্রেক্ষিতে দেখাটার মধ্যে ফারাকটা কিসে হচ্ছে?**

হিরণ : প্রথমত ওরা রাগরাগিণীটাকে describe করেছেন। রাগ-রাগিণী শোনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি ওটা নয়। রাগ-রাগিণীটার দৃশ্যগত ফল ওটা। 'মেঘমল্লার' এর সময় মেঘ আসছে, বৃষ্টি আসছে—এইসব এলিমেন্টগুলো ভিসুয়্যাল কোড্। এই ভিসুয়্যাল কোড্গুলোকে একটা জায়গায় অ্যাসেম্বেল করা হচ্ছে। তাতে কোনো মিউজিক নেই। মিউজিকের খালি ক্যাপশানটা আছে। ওটা কোনো মিউজিকও নয়, ছবিও নয়। ওটা একটা বিবরণ। ছবিতে দেওয়া বিবরণ। এই সময়ে বসে আমার দৃশ্যসংস্কার যেগুলো কাজ করতে করতে তৈরি হচ্ছে—লাইট আর ফর্ম নিয়ে কাজ করতে করতে—সেই দৃশ্য সংস্কারে এই মেঘমল্লারটা কীভাবে appear করছে ইমেজ হিসেবে সেটা আমি viewer এর সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। যারা দেখছে তারাও বলছে এটা মেঘমল্লার। তাকে বিবরণ দিতে হচ্ছে না। আমি সবসময় viewer এর সঙ্গে একটা experience এ চলে যেতে চাই। কনসেপ্টুয়াল আর্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় খালি কনসেপ্ট্টাকেই বড় করে দেখা হয়, অ্যাক্ট্ টাকে বড় করে দেওয়া হয় অ্যাক্টিভিটিস্টাকে নয়। আর্টিস্ট হচ্ছে সেকেণ্ডারি। যেখানে মাঠে দুটো একটা ইউরিন্যালকে বসিয়ে দিয়ে বলা হয় ফাউন্টেন—ঝর্ণাধারা। ধারণাটাই বড় কথা। আর্ট এবং আর্টিস্ট সেকেণ্ডারি।

**মৌলি : আপনার প্রত্যেকটা ছবিতেই আপনি কিছু কিছু স্পেসিফায়েড মুহূর্তকে খুব সুন্দর ভাবে ধরে রাখতে চেয়েছেন। শিল্পের যে জন্ম দেয় তার মধ্যে দুটো টেনশান কাজ করে। কখনও কখনও ভয়ঙ্কর ঈগল আকাশে উড়ে বেড়ায়, আবার কখনও একা থাকতে ভালো লাগে বলে আপনি বলছেন। তখন সময় থেমে যায়। এই টেনশানগুলো এই মুহূর্তগুলো কীভাবে উঠে আসে আপনার ছবিতে। একটা মৃত্যুর টেনশান, দুটো সাইকেল রিক্সার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া—এর সঙ্গে কুয়োতে বড়দা পড়ে যাওয়ার পর মায়ের পাগল হয়ে যাওয়ার ঘটনা—ভাইপো জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছে—তার চোখে সেই সময়টা স্থির হয়ে যাওয়া—একটা স্থির হয়ে থাকা নীরবতার টেনশান—আর একটা চিৎকার এই মুহূর্তগুলো কীভাবে উঠে আসে।**

**রাতুল : মুহূর্তের কথা যখন উঠছে, তাহলে কী আপনি ইম্প্রেশনিস্ট স্টাইলটাকে খুব অ্যাডাপ্ট করছেন। ওরাওতো মুহূর্তকে ধরার চেষ্টা করেছেন। একটা ক্লিক্কে ধরেছেন। আপনি কি সেটাকে নিজের ছবির মধ্যে খানিকটা নিজের মতো করে আনার চেষ্টা করছেন।**

হিরণ : এখানে আর একটা খবর দিই। যেহেতু এটা নিয়ে বেশি কথা বলা যায় না। সেটা হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে হয়তো তাই। আবার তাই নয়। তাই নয় কেন। সেটা খুব মজার। আমি যখন নাটকের documentation করতে যাই, নাটকের মহড়ায় আমি যখন ছবি আঁকি—আমার একটা অভ্যেস আছে নাটকের মঞ্চ তৈরি করার অনেক অনেক আগে থেকে আমি মহড়ায় ছবি আঁকতে থাকি। আমার অ্যাজেণ্ডা হচ্ছে একটা চরিত্র তার যেই

নাম হোক, সে মঞ্চে আরেকটা চরিত্রে অভিনয় করছে, X থেকে Y হয়ে যাচ্ছে—এই যে Y তে transfer করে যাচ্ছে—হাঁটা, দাঁড়ানো, স্বর, অভিজ্ঞতা সব বদলে যাচ্ছে—এই অমুক হয়ে যাওয়ার আগের একটা মুহূর্ত আছে, অমুকও নয়, তমুকও নয়—এই যে আলো-আঁধারির জায়গাটা—আমি সবসময় মুহূর্তকে নিয়েই কাজ করছি না। আমি বলতে চাইছি মুহূর্তেরও আগে একটা মুহূর্ত আছে। একটা না মুহূর্ত আছে। সেটা adjust হয় না। সেটাই হচ্ছে আসল সত্য। আমি যেমন ছবি আঁকার আগে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। দুঘন্টা-তিনঘন্টা কোনো কাজ করি না। আমি কি কাজ করছি না। আমি কি স্থির, বসে আছি। আমি কি সত্যি কাজ করছি না! আমি কি সত্যি স্থির বসে আছি তা তো নয়। এই যে transition period আমি ওটাকে বলি landing zone। যে কোনো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে একটা landing zone লাগে। সেটা না হলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায় না। এই landing space টা আমার কাছে খুব Important। এই জায়গাটাকেই আমি সবসময় অ্যাড্রেস করতে চাই। এই ঘটনাগুলো ঘটলো—এই ঘটনাগুলোর মধ্যে যে না-মুহূর্তটা আছে সেটার চেহারাটা কীরকম। আমার ছবিতে, লেখায় সেটা কেমন করে আছে। সেটা আমি দেখেছি—একজন ছৌ নাচিয়ে যখন arena-র মধ্যে ঢোকে সে ঢুকে কিছুক্ষণ স্থির থাকে, আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে ওঠে। এই যে একটা প্রস্তুতি—একটা বিরাট আবেগ সুনামির মতো লাফ দেবে—দর্শকও থম্ মেরে আছে—এইটা আমাকে বিরাট অ্যাট্রাক্ট্ করে।

**মৌলি : শিল্পীরা শিল্পের আধারকে ভুলে যায়। ভুলে যায় যা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তাই চিত্রের কথন। গ্যালারিতে উল্টো সোজা ক্যানভাসগুলো ছড়িয়ে থাকে—সেই কথাটা বলছি। সেটাও একটা ছবি বলে আপনি ভাবছেন। ব্রাকুঁজির উল্টো কচ্ছপ আর মিরোর উল্টো করে রাখা ছবি—আবার আপনি বলছেন এটা অবহেলা নয়—এটা একটা আবিষ্কার—মনের বদ্ধতা কাটানো আবার এটাই আপনার মঞ্চ নির্মাণের পশ্চাদ্‌পট—এটাতো দুটো আলাদা আলাদা স্তর—এটাওতো একধরনের সত্যকে খুঁজে পাওয়া।**

**হিরণ :** এই ঘটনাগুলোর পেছনেও আগের ঘটনা আছে। পরের ঘটনা আছে। ব্রাকুঁজি যখন জানতে পারলেন প্রদর্শনীতে কচ্ছপ উল্টো করে রাখা হয়েছে—ছবির জগতে উল্টো-সোজার একটা বিরাট গণ্ডোগোল আছে। এটা একটা গর্হিত অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। ব্রাকুঁজিকে যখন জানানো হল তিনি মুহূর্তেই বললেন—ওটা উড়ন্ত কচ্ছপ। এখন এই অ্যাকসেপ্‌টেন্সিটাই বড় ব্যাপার—ছবিটা তৈরি হয়েছিল একটা ভাবনায়। রাখা হয়েছে একরকমভাবে। যে মুহূর্তে এটা উনি মেনে নিলেন এবং উনি আবিষ্কার করলেন ওটা উড়ন্ত কচ্ছপ তখনই কিন্তু কচ্ছপটা উড়তে শুরু করল। আর একটা ঘটনা বলি—কান্দিনিস্কি বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তার এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল। এরা আগে বিখ্যাত হয়েছেন না পরে বিখ্যাত হয়েছেন জানিনা। কিন্তু বিখ্যাত হবার একটা ঢঙ্ আছে। কান্দিনিস্কির ঘরে তার পরিচারিকা একটা ছবি উল্টো করে রেখে চলে গেছিল। কান্দিনিস্কি ঘরে ঢুকে

বলেন—এখানে একটা অপরিচিত ছবি দেখছি—ছবিটা কার। ওরই ছবি, কিন্তু উল্টো করে রাখার জন্য recognize করতে পারছেন না। তারপর সেটাকে সোজা করে বুঝতে পারেন। Abstraction টার মজাটা হচ্ছে পরিচিতি, সাযুজ্য এইটার যে একমুখিতা—gravitational theory অনুযায়ী আমরা উপর নীচ বলি—এই gravitational theory টা চ্যালেঞ্জ হয়েছে ১৯৩০ এর পর থেকে—সেটা শিল্পীরা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা—করলে ভালো, না করলে আরো ভালো—আমাদের যেমন ভাবনাচিন্তার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের একটা ভূমিকা আছে—সংগীতে আছে, শিল্পে আছে, কবিতায় আছে—ছবিতেও সেটা আছে। Signature টা নীচের দিকে হয়। ওটা ছবিটার মাথাটা কোনদিকে সেটা denote করার জন্য দেওয়া হয়। এবার মজাটা হল—এই ছবিটার যদি মাথা থাকতে হয় তাহলে ছবিটা খাড়া ভাবে আঁকতে হবে। ছবি যদি খাড়া ভাবে আঁকতে হয়, তাহলে খাড়া ভাবে দাঁড়াতে হবে। এইবার ছবি আঁকা হচ্ছে মাটিতে ফেলে। যখন জ্যাকসন পোলক যাকে জ্যাক্ দ্য রিপার বলা হয়—তিনি মাটিতে ফেলে আঁকছেন। মাটিতে ফেলে আঁকলে তার গ্র্যাভিটেশান কোনদিকে যাবে। ল্যাটিচিউড-লংটিচিউড পাল্টে যাচ্ছে তো। রং ছড়িয়ে ছড়িয়ে আঁকছেন। সেই ছবিটাকে ভার্টিক্যালি টাঙানো হচ্ছে। এই যে সমস্যাগুলো এলো এই যে গ্র্যাভিটেশান প্রবলেম গুলোকে অস্বীকার করা শুরু হলো—আবার সেটাকে স্বীকার করাও শুরু হলো—একইসঙ্গে অস্বীকার আবার স্বীকারও করা হচ্ছে—আমাদের চোখ যেটা দেখতে অভ্যস্ত সেটা ভেঙে গিয়ে আমাদের অনভ্যস্ত চোখ দিয়ে আবার আবিষ্কার করছি—এইজন্য আমি আবিষ্কারের কথাটা বলছি। ওই যে ব্রাঁকুজি আবিষ্কার করলেন, মিরো আবিষ্কার করলেন—ব্যাসিলিস বলে একজন ভদ্রলোক তিনি ছবিকে উল্টোই করতে লাগলেন। আমি আজ পর্যন্ত অনেক জানার চেষ্টা করেছি যে ব্যাসিলিস সোজা করে এঁকে উল্টে দেয় না উল্টো করেই আঁকে। 'সিমা' তে ওঁর ছবিও এসেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেনি।

**রাতুল : এই প্রসঙ্গে একটা খুব মজার কথা মনে পড়লো। সোলানাসের 'দ্য ক্লাউড' বলে একটা ছবি আছে। সেটার সূত্রপাতটাই হচ্ছে আর্জেন্টিনার সমস্ত গাড়ি, সমস্ত লোক পেছন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওখানে actually থিম্ ছিল যে নাটক আস্তে আস্তে অবলুপ্তির দিকে চলে যাচ্ছে এবং যেখানে শিল্পের পতন হচ্ছে সেখানে গোটা সভ্যতাটা পিছন দিকে হেঁটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এইটা কী ছবির ক্ষেত্রে ভাবতে পারি, যে সময় যত অন্ধকার হচ্ছে ছবি ততো উল্টে যাচ্ছে।**

হিরণ : মার্ক সেগাল এই উল্টো সোজা নিয়ে কাজ করেছিলেন। বিশেষতঃ এই ড্রিম সিকোয়েন্স নিয়ে কাজ করেছিলেন। তাঁর ছবিতে অনেক চরিত্র আছে যারা উল্টো করে হাঁটছে। এটা এই কনটেক্স্টে যে অন্যান্য সব জিনিস ছাড়া দাঁড়িয়ে আছে, একটা জিনিস উল্টে গেছে। উল্টো সোজার এই বিরোধটা কখনও মেটেনি। আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের পিছন দিকে নিয়ে যাবে না।

**মৌলি : ছবিতে শেডের যে ব্যাপারটা থাকে, ক্রমশঃ হাল্কা থেকে গাঢ়-র দিকে যে শেড্‌গুলো চলে যায়। আবার একটা ছবি যেখানে রঙ গড়িয়ে গেছে, সেখানে ঐ গড়িয়ে আসা রঙটা নীচুর দিকে হলেও সেখানটা গাঢ় থাকে—এইরকম ছবি থেকে আমি কী ভাবে বুঝব শিল্পী কীভাবে ছবিটাকে রাখতে বা আঁকতে চেয়েছেন।**

**হিরণ :** ছবিকে আমরা একটা ভাষা দিয়ে বুঝতে চাইছি। এবং যেহেতু ছবি একটা দৃশ্য ভাষা তাই তাকে সেই ভাষা দিয়েই বুঝতে হবে। কথ্যভাষা দিয়ে বোঝা যাবে না। আমরা যে কোন ভাস্কর্যকেই আমাদের অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে চাই। আর সেখানেই গণ্ডগোলটা ঘটে। বিমূর্ততার মধ্যে কোনো গ্র্যাভিটেশান কম্‌পালসারি নয়। একটা ছবি অনেক সময়, আঁকার পরে উল্টে যায়, অন্য দিকে চলে যায়। ভিস্যুয়াল কমফর্ট ডিস্‌কমফর্ট আছে কি না অনেক সময় এর উপর নির্ভর করে। এটা নির্দিষ্ট নয়, আর তাই এ সার্কুলার। তাই নানামাপে, নানা ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়াতে পারে। এই খোলা জায়গাটা আছে বলেই।

**রাতুল : কান্দিনিস্কির ছবিতেও জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্নস প্রচুর। মানে রেখা, বিন্দু। আপনার ছবিতেও সব রেখা। সব প্যাটার্নগুলোকে ভাঙা। এটা কী আপনার খুব সচেতন বিদ্রোহ প্যাটার্ন নির্ভরতার থেকে?**

**হিরণ :** কান্দিনিস্কি যেসময়ে এই কাজটা করছেন সেটাকে শিল্প-ইতিহাস হিসাবে দেখতে হয়। তিনি প্রথমে খুব ল্যাণ্ডস্কেপ নিয়ে কাজ করতেন। মনজেঁয়ার যেভাবে ল্যাণ্ডস্কেপ নিয়ে কাজ করতে করতে একটা সময়ে খুব রিজিড্ হরাইজেন্‌টাল, ভার্টিকাল আঁকতে শুরু করলেন। উনি বলতেন অরণ্য সমুদ্রে স্নান করছে। উনি সেটাকে Simplified করতে লাগলেন। সেটা আরো ইলাবরেট্ করা যায়। কান্দিনিস্কির এই কাজটার সময়ে রাইট ব্রাদার্স আকাশে উড়ছে। ক্ষেত-পর্বত সমস্তটা জুড়ে একটা flat surface তৈরী হয়েছে। আস্তে আস্তে এটা প্যাটার্নের দিকে যাচ্ছে। ভার্টিকাল, হরাইজেন্‌টাল লাইন,—এদের অ্যাসিমিলেশানগুলো কান্দিনিস্কিকে খুব হন্ট্ করতে থাকে। গণেশ হালুই-এর ছবি নিয়ে আমায় একটা লেখা লিখতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুজনের তফাত আছে। অজন্তা-ইলোরা বা আমাদের মন্দিরগাত্র নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের উপর অলংকারের একটা প্রভাব পড়ে। তারপর উনি যখন সব বাদ দিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন, সিঁড়ি নিয়ে, বেনারস নিয়ে তখন সেখানেও অলংকার পাওয়া গেল। আমাদের বিশ্ব ও শরীরটাও তো অলঙ্কৃত। এত অলংকার আমার কাছে সর্বদাই বাহুল্য মনে হয়েছে। আমাদের ভাবনায় এ যেন একটা চাপিয়ে দেওয়া বোঝার মতো। এই জায়গা থেকে আমার একটা স্বাভাবিক অলঙ্কার বিরোধিতা রয়েছে।

**রাতুল : আপনি ছবির বদলে কাগজ ছিঁড়ে কোলাজের কাজটা প্রচুর করেছেন। এটাকে আপনার নিজস্ব সিগ্‌নেচার বলা যেতে পারে। তো আসল ছবিটা দেখলে যেটা মনে হয়, কাগজের উপর, এতো মোটা করে রঙ মারা থাকে যে একটা 3D**

**এফেক্ট আসে। আপনি কী এই কাগজের ছেঁড়া দাগগুলো ইচ্ছা করে রাখেন আর একটা ডাইমেনশান্ বোঝাবার জন্য? কাগজ ছিঁড়ে কাজ করার আপনার ভাবনাটা কী?**

**হিরণ :** আমি যে পারস্পেক্টিভ্-এ গেছি সেটা নো পারস্পেক্টিভ্। পরবর্তী কালে পিকাসোর কিউবিস্ট্ সময়, কান্দিনিস্কির দ্বিমাত্রিক ছবি থেকে লিনিয়ার ডাইমেনশানে গেল সেটা কিন্তু স্ক্রিপট্-এর প্রভাবে। তারা শিখল এটাই আসল রিয়্যালিটি। আমাদের নির্মিত রিয়্যালিটি ভিউয়ারকে একটা ইল্যুশন ডিসিভ্ করছে। আমি দেখলাম এই ভিস্যুয়াল এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দ্বিমাত্রিকের ভেতরেও আড়াই মাত্রিক বলে একটা জিনিস আছে। আমি এই কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে লাগানোয় কিছুটা অবসেসড্ হয়ে পড়েছি। আর আমি সম্প্রতি একটা কাজ করেছি সেটা এই পয়লা জানুয়ারি থেকে বেরোবে একটা পত্রিকায়। অশোক মিত্র ও শঙ্খ ঘোষের নেতৃত্বে একটা পত্রিকা বেরোচ্ছে 'আরেকরকম' বলে সেখানে আমি এই কাগজ ছেঁড়াটাকে অনেকটা extend করেছি। কাগজ তৈরি হওয়ার সময় শাড়ি জামার জুতোবোনার মতো দু'রকম আঁশ আছে। কাগজ একটা দিকেই খুব ভালো করে ছেঁড়া যায়। কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে তার ভিতরে মণ্ড দিয়ে যেসব স্তরগুলো তৈরী করা হয়। সেগুলো বেরিয়ে আসে। আমার দুর্ঘটনার প্রতি একটু বেশী আকর্ষণ। কারণ আমার মতে সব ঘটনাই দুর্ঘটনা। আমি কাগজ ছিঁড়ে কখনও ফেলে দিই না। একদিন একটা কাজ করলাম সব বাতিল করে দেওয়া কাগজগুলো জুড়তে জুড়তে একটা ছবি হয়ে গেল। তার মানে কোনো জিনিসই ফেলে দেওয়া যায় না। কোনো কথা আমাদের হাওয়ায় মিলিয়ে যায় না। কোনো ছেঁড়া কাগজ পড়ে থাকে না। যেমন আমি আকাশ বাংলার লোগো করতে করতে দেখলাম যেগুলো করে ফেলে দিয়েছি তার মধ্যেই ঐ 'B' টা আবিষ্কার করলাম। ওটা ঐ কাটাকুটি থেকে হয়ে গেছে। এটা হয়তো আমি করেছি, কিন্তু আমি করিনি। আমার সবসময় মনে হয় অবচেতন শিল্পই সজীব শিল্প।

**মৌলি : আপনি বলছেন মঞ্চ নির্মাণে বডি ল্যাঙ্গোয়েজ একটা সমান্তরাল ভাষা। এটা একটা অভিব্যক্তি। আপনি বলছেন অভিনেতার শরীরেও ঢেউ আছড়ে পড়ে। আমি অনবরত মঞ্চের সংলাপ শুনতে পাই। অভিনেতা আর মঞ্চের ভাষাগুলো কী ক্রমশঃ ছবির ক্ষেত্রে একটা শরীর পেয়ে যায়?**

**হিরণ :** আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার বোধ থেকে মনে হল যে আমার পারিপার্শ্বের যে চিত্রজগৎটা রয়েছে সেটা ভীষণ একটা বদ্ধ জলাশয়। আমি এর বিপরীতে ফুরফুরে হাওয়ার খোঁজে পারফর্মারদের সঙ্গে ঘুরতে থাকি। পারফর্মারদের নিজের একটা জগৎ, একটা শুরু একটা শেষ আছে। আমি তাদের সঙ্গে কাজে যাচ্ছি, কাজ থেকে ফিরে আসছি। মানে আমার কাজ আমাকে নির্মাণ করছে। আমার কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ছবিটা আমাকে আঁকছে। আমি নির্মিত হচ্ছি আবার সেটা ভেঙে যাচ্ছে। আমি এটা অ্যালাও করে নিজেকে সেভাবে এগিয়ে দিচ্ছি। চিত্র, ভাস্কর্য, দৃশ্য দিয়ে আমাকে জবাই করা হচ্ছে। শিল্পী

মনে করে সেই সৃষ্টিকর্তা। এবং তখনই সে সৃষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। সৃষ্টিরও মান অভিমান, রাগ দুঃখ আছে। এটা থেকেই আমি নাটকে কাজ করতে শুরু করি, কিন্তু সব নাটকই যে আমাকে খুব উজ্জীবিত করে তা নয়। আবার আমি অনেকদিন 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত'র ঘোরের মধ্যে ছিলাম। হয়তো কেউ সংলাপ বলছে না, কিন্তু ঐ স্কেলটা মিলে যাচ্ছে। ছবিতে অনেকদিন ধরে তিস্তাপার আমাকে হন্ট্ করেছিল। 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়ন শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে করানো হয়নি। কিন্তু 'রক্তকরবী' নিয়ে আমি সুমন এবং ঋতুপর্ণ ঘোষ অনেকদিন কাজ করেছিলাম। সেটাও আমাকে ভীষণ হন্ট্ করেছে। আমার ছবিতে এই সবকিছুর প্রচুর প্রতিফলন ঘটতে থাকে।

**মৌলি : আচ্ছা, হিরণদা, আজ এই পর্যন্তই থাক। ভালো থাকুন। ছবি আরো আরো নতুন হয়ে উঠুক। আমরা সমৃদ্ধ হই।**

সাক্ষাৎকার গ্রহণ :
রাতুল ঘোষ, মৌলি তরফদার, ঐশিক দাশগুপ্ত